রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩) কবি, নাট্যকার, গীতিকার। ১৮৬৩ সালের ১৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম। পিতা সুকণ্ঠ গায়ক কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের দেওয়ান এবং মাতা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈত প্রভুর বংশধর। তাঁর দুই অগ্রজ রাজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল এবং এক ভ্রাতৃজায়াও সাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল হুগলি কলেজ থেকে বিএ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ (১৮৮৪) পাস করেন। পরে কিছুদিন চাকরি করে তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য লন্ডন যান এবং সেখানে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। লন্ডনের সিসিটার কলেজ থেকে তিনি কৃষিবিদ্যায় এফ.আর.এ.এস ডিগ্রি এবং রয়েল এগ্রিকালচারাল কলেজ ও এগ্রিকালচারাল সোসাইটির এম.আর.এ.সি ও এম.আর.এস.এ উপাধি লাভ করেন। বিলেত থেকে ফিরে তিনি মধ্যপ্রদেশে জরিপ ও রাজস্ব নিরূপণ ট্রেনিং নেন এবং সরকারি ডেপুটির চাকরি পান; পরে তিনি দিনাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা মানুষ; এজন্য কর্মক্ষেত্রে তিনি অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। ১৮৯০ সালে বর্ধমান এস্টেটের সুজামুটা পরগনায় সেটেলমেন্ট অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে তিনি প্রজাদের স্বার্থে ছোটলাটের বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হননি। বিলেত থেকে ফেরার পর প্রায়শ্চিত্ত করার প্রশ্ন উঠলে তিনি তা অস্বীকার করেন এবং এজন্য তাঁকে অনেক বিড়ম্বনা সইতে হয়। সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে তাঁর একঘরে (১৮৮৯) নামক পুস্তিকায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯০৫ সালে কলকাতায় ‘পূর্ণিমা মিলন’ নামে একটি সাহিত্যিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তখনকার শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসেবী বাঙালিদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এ সময় তিনি ‘ইভনিং ক্লাব’ নামে অপর একটি সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি প্রথম অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। বিলেতে থাকা অবস্থায় তিনি সেখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়-কৌশল ও রঙ্গালয়-ব্যবস্থা নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেন, যা পরবর্তীকালে নাটক রচনা ও অভিনয়ে তাঁকে গভীরভাবে সহায়তা করে।

দ্বিজেন্দ্রলাল কৈশোরেই কাব্যচর্চা শুরু করেন। ছাত্রজীবনে তাঁর আর্য্যগাথা (১ম ভাগ, ১৮৮২) এবং বিলেতে থাকাকালে Lyrics of Ind (১৮৮৬) কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সাল পর্যন্ত তিনি মূলত কাব্যই রচনা করেন এবং এ সময় পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ বারোটি।

এরমধ্যে প্রহসন, কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক কবিতাও রয়েছে। জীবনের শেষ দশ বছর তিনি প্রধানত নাটক রচনা করেন। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক সব ধরনের নাটক রচনায়ই তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তাঁর মধ্যে যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছিল, ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি ষোলোটি নাটক রচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধমূলক রচনাগুলিও অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। দ্বিজেন্দ্রলালের উলে­খযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো: কাব্য আর্য্যগাথা (২য় ভাগ, ১৮৯৩), মন্দ্র (১৯০২), আলেখ্য (১৯০৭), ত্রিবেণী (১৯১২); নকশা-প্রহসন একঘরে (১৮৮৯), সমাজ-বিভ্রাট ও কল্কি অবতার (১৮৯৫), ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুনর্জন্ম (১৯১১); পৌরাণিক নাটক পাষাণী (১৯০০), সীতা (১৯০৮), ভীষ্ম (১৯১৪); সামাজিক নাটক পরপারে (১৯১২), বঙ্গনারী (১৯১৬); ঐতিহাসিক নাটক তারাবাই (১৯০৩), রানা প্রতাপসিংহ (১৯০৫), মেবার-পতন (১৯০৮), নূরজাহান (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১); প্রবন্ধগ্রন্থ কালিদাস ও ভবভূতি (১৯১০-১১) প্রভৃতি। ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য তিনি যশস্বী হয়ে আছেন। তাঁর অধিকাংশ নাটক কলকাতা ও তার বাইরে সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়। সাহিত্যকর্ম হিসেবে তাঁর অনেক নাটক উচ্চশিক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতশিক্ষার হাতেখড়ি পিতার নিকট। তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন পিতার নিকট থেকে। তারপর বিলেতে থাকা অবস্থায় তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভাকে শানিত করেন, যা পরবর্তীকালে বাংলা গানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারা উদ্ভাবনে সহায়ক হয়।

উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলা গানের আধুনিকীকরণে যে পঞ্চ গীতিকবি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রযুগে বাংলা কাব্যসঙ্গীতে বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ ও আধুনিক গান রচনায় তিনি ছিলেন একজন সার্থক রূপকার। নাটক রচনা ও পরিচালনায় তাঁর অসামান্য অবদান থাকলেও তিনি সঙ্গীতকার হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রায় পাঁচশত গান রচনা করেন। প্রথমদিকে তাঁর গান ‘দ্বিজুবাবুর গান’ নামে পরিচিতি ছিল; পরবর্তীকালে তা ‘দ্বিজেন্দ্রগীতি’ নামে পরিচিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল খুব অল্পবয়স থেকেই গান রচনা করতেন এবং নিজেই সুর দিয়ে গাইতেন। বিলেত যাওয়ার আগে মাত্র সতেরো বছর বয়সের মধ্যে লেখা একশো আটটি গান নিয়ে তাঁর প্রথম গীতসংকলন আর্য্যগাথা (প্রথম ভাগ) ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়। কিশোর বয়সে লেখা এ গানগুলিতে প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য ও লাবণ্য, জগতের শোক-জরাজাত দুঃখাবসন্নতা, ঈশ্বরভক্তি এবং স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। এ পর্বের একটি গান হলো: ‘গগনভূষণ তুমি জনগণমনোহারী!/ কোথা যাও নিশানাথ, হে নীল নভোবিহারী!।’

দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৮৭ সালে এগারো বছর বয়সের সুরবালা দেবীকে বিবাহ করে সংসারজীবন শুরু করেন। এ সময়কালে দাম্পত্যসুখমগ্ন দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেন অপূর্ব সব প্রেমের গান, যা ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত আর্য্যগাথা-র দ্বিতীয়ভাগে স্থান পায়। এ পর্বের দুটি গান হলো: ‘ছিল বসি সে কুসুম-কাননে/ আর অমল অরুণ উজল আভা/ ভাসিতেছিল সে আননে।’ এবং ‘আজ যেন রে প্রাণের মতন/ কাহারে বেসেছি ভালো!/ উঠেছে আজ মলয় বাতাস,/ ফুটেছে আজ মধুর আলো।’ প্রথম গানটি কীর্তন ঢঙে রচিত এবং রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল। এ ধরনের গান রচনার মূল প্রেরণা ছিল স্ত্রী-প্রণয়। তাই প্রথম ভাগের গানে যেখানে প্রকৃতিপ্রেম ও দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস দেখা যায়, সেখানে দ্বিতীয়ভাগের গানে দেখা যায় তাঁর প্রণয়োচ্ছ্বাস।

বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয়ে গান রচনা করার ক্ষমতা ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সহজাত। তদুপরি ওস্তাদ পিতার নিকট থেকে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে তালিম নেওয়ার ফলে সঙ্গীত রচনায় পাশ্চাত্য সুর আহরণ ও আত্তীকরণ তাঁর জন্য সহজসাধ্য হয়েছিল।

বিলেত থেকে ফেরার পর প্রথম দিকে তিনি বাংলা গান রচনায় সরাসরি পাশ্চাত্য রীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, যা সেকালের শ্রোতৃবৃন্দের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাই পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য রীতিকে বাংলা গানের আদর্শ অনুযায়ী পরিবর্তন করে তিনি ব্যবহার করতে শুরু করেন। এ পর্যায়ে বেশ কিছু স্কচ, আইরিশ ও ইংরেজি গান ভেঙ্গে তিনি বাংলা গান তৈরি করেন। এমন কয়েকটি গান আর্য্যগাথা-র দ্বিতীয় ভাগে পাওয়া যায়।

এর কিছুকাল পর তিনি বিভিন্ন বিষয়, যেমন প্রেম, হাসি, ব্যঙ্গ, দেশাত্মবোধ, ভক্তি ইত্যাদিকে আশ্রয় করে গান রচনা করেন। সেকালে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো আধুনিক ঢঙে চমৎকার হাসির গান রচনা করা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ দক্ষতা তিনি অর্জন করেছিলেন বিলেতে থাকাকালে। তিনি সেখানকার হাসির গান শুনে সেই ঢঙে গান রচনা করতেন।

সময়ের প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেন অপূর্ব সব ব্যঙ্গরসাত্মক গান। স্বার্থপর রাজনীতিবিদ এবং তথাকথিত দেশভক্তদের উদ্দেশ্য করে রচিত এমন একটি ব্যঙ্গরসাত্মক গান ‘নন্দলাল’। গানটির মধ্য দিয়ে তিনি দেশসেবার নামে স্বার্থপরতার স্বরূপ তুলে ধরে তীব্র বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেন।

পরিহাসমূলক গান রচনাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এমন একটি গানের কিছু অংশ: ‘রাজা। দেখ হতে পার্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর/ কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির; পারিষদ বর্গ। হাঁ তা বটেইতো তা বটেইতো!’ দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে এ গানগুলি ব্যবহার করেছেন। এছাড়া শুধু নাটকের প্রয়োজনেই তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। তাঁর গান নাটকে বেশি ব্যবহূত হওয়ায় সকলের নিকট তা খুব সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে থাকার সময় প্রখ্যাত খেয়ালগায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সুরেন্দ্রনাথ খেয়ালগানে টপ্পার চাল মিশিয়ে এক ধরনের চমৎকার গান গাইতেন, যাকে বলা হয় টপখেয়াল। তাঁর সাহচর্যে দ্বিজেন্দ্রলাল একজন দক্ষ সঙ্গীতকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রেম ও বিরহমূলক বেশকিছু গান সুরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এ টপখেয়াল রীতিতে রচিত।

১৯০৩ সালে স্ত্রী সুরবালার মুত্যু দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতজীবনে বিরাট পরিবর্তন আনে। আনন্দ ও হাসির গান রচনার ভুবন থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটে। এক সময় যিনি দাম্পত্য প্রেমের আবেশে রচনা করেছিলেন: ‘তোমারেই ভালবেসেছি আমি/ তোমারেই ভালবাসিব। তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে/ তোমারই সুখে হাসিব\’- স্ত্রী-বিরহক্লিষ্ট সেই তিনিই আবার লেখেন: ‘আজি তোমার কাছে/ ভাসিয়া যায় অন্তর আমার/ আজি সহসা ঝরিল/ চোখে কেন বারি ধার?’

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশে যে গণজাগরণমূলক গান রচনার প্রচলন শুরু হয়, তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান ছিল অসামান্য। এ সময় তিনি প্রচুর দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন যা স্বদেশীদের প্রচন্ডভাবে উদ্দীপিত করে। পরবর্তীকালে দেশাত্মবোধক গান রচনাতেই তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এভাবে দেখা যায় বিভিন্ন ঘটনা, যেমন বালিকাবধূর সাহচর্য, মাত্র ষোলো বছরে দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ইত্যাদির প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতচিন্তা ক্রমবিবর্তিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গানগুলির মধ্যে ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’, ‘ধনধান্যপুষ্পভরা’ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরাধীন ভারতে বাঙালিদের মধ্যেই যেমন প্রথম বিপ­বীর জন্ম হয়েছিল, তেমনি বাঙালির কণ্ঠেই প্রথম জলদমন্দ্র ধ্বনিত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’ গানের মধ্য দিয়ে।

ভারতীয় রাগসঙ্গীতের কাঠামোয় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের চালের সমন্বয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের উদার ও ওজস্বী সুরে দেশাত্মবোধক গান রচনা বাংলা গানে এক অভিনব ধারার সূচনা করে। তাঁর গানে রয়েছে সুরের সাবলীলতা। একটি নির্দিষ্ট রাগকে অবলম্বন করেও রাগের সরাসরি প্রভাবকে ছাপিয়ে কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয়ে সঙ্গীতে ভাব ফুটিয়ে তোলা রবীন্দ্রনাথের পরে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালেই সম্ভব হয়েছে। তাঁর ‘ধনধান্যপুষ্পভরা’ গানটিতে ‘কেদারা’ রাগের কাঠামোয় অন্তর উজারকরা দেশাত্মবোধক কথাগুলি সাজানো হয়েছে। এখানে ‘সে যে আমার জন্মভূমি’ লাইনটিতে ইংরেজি গানের ঢঙে তিন রকম সুরের উত্থান-পতনের গতিতে সুর রচনা দ্বিজেন্দ্রলালের এক অসামান্য সৃষ্টি, যা আজও তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ সঙ্গীতপ্রতিভার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল বিদেশী শাসকদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষী মনোভাব, যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচিত বিভিন্ন স্বদেশী সঙ্গীতে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের চিত্তাকর্ষক দিকগুলি উত্তমরূপে আত্মস্থ করে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তিনি তা প্রয়োগ করেন বাংলা গানে। বাংলা গানে প্রথম বিদেশী কোরাস গানের ঢঙ প্রয়োগ তাঁর বিশেষ অবদান।

প্রেমের গান রচনায়ও তিনি ছিলেন কৃতবিদ্য। গানের কথার কোনো অংশে কতটা গতিতে সুরের আরোহণ-অবরোহণ হলে প্রেমের আবেগ কতখানি ফুটে উঠবে, সে বিষয়ে তাঁর সচেতনতা লক্ষণীয়। প্রেমের গানে কখনও কখনও বাংলা টপ্পার কোমল দোলা দিয়ে গানের আবেশ তৈরি করে মোহনীয় সুরসৃষ্টি তাঁর অসাধারণ কীর্তি। একজন শিল্পীর কণ্ঠের আয়ত্তের মধ্যে স্বর ক্ষেপণ করার মতো স্বরপরিকল্পনায় তিনি ছিলেন সদা সতর্ক। সে কারণে সুরের একটা উদার ও ওজস্বী ভাব সব সময় তাঁর গানে পরিলক্ষিত হয়।

অসাধারণ শিল্পকর্মের মূলতত্ত্ব যে সত্য, সুন্দর ও আনন্দ- দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতকর্মে তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে; তাই তাঁর গানে রয়েছে মৌলিকত্বের ছাপ। বাংলা কাব্যসঙ্গীতে তথা আধুনিক বাংলা গানে সুর, ভাব ও বিষয়ভিত্তিক রচনায় বিভিন্ন ধারার সমন্বয়করণ দ্বিজেন্দ্রলালের এক মহৎ কীর্তি। একটি সুস্থ সঙ্গীতপরিমন্ডল সৃষ্টিতে তাঁর এ অবদান বাংলার সঙ্গীতাঙ্গনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৩ সালের ১৭ মে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।